যুগান্তর

তারিখ: 26 JAN 2014
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ১-৩

বদরুদ্দীন উমর

বাংলাদেশের দেউলিয়া শিক্ষানীতি

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি স্কুলের পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর জাতীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর নিজেদের শিক্ষানীতির অনেক গৌরব-কীর্তন করলেন। কিন্তু তাদের তথাকথিত এই শিক্ষানীতি নিয়ে যে গৌরব করার কিছু নেই, এটা যে এক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ব্যাপার— এ বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে। কিন্তু তার আগে বলা দরকার, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি বলতে যা বোঝায় তার কিছুই দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষানীতির নামে এখানে যা করা হয়েছে তাতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রায় ধ্বংসের দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

১৯৭২ সালে শিক্ষানীতির নামে প্রথমেই যা করা হয়েছিল তা হল, বাংলার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার নামে সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি। এ নিয়ে আমি বহুবার এবং ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে আবার তা বলা দরকার। আমরা পাকিস্তান আমলে মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছি। ভাষা আন্দোলনের সময় শুধু রাষ্ট্রভাষা নয়, বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাও ছিল একটা প্রধান দাবি। কাজেই ১৯৭২ সালে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার মধ্যে দোষের কিছু ছিল না। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষানীতির অভাব এবং যেভাবে এ নীতি কার্যকর করার কথা সেটা না করায় এক মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল, একেবারে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরে ইংরেজি বাদ দিয়ে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দাবির জনপ্রিয়তার কারণে রাজনৈতিক ফায়দা উঠানোই এই সিদ্ধান্ত ও ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় তাড়াহুড়ো করে এ কাজ করা হয়েছিল। শুধু প্রাথমিক, এমনকি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হলে তার মধ্যে কোনো ক্ষতির ব্যাপার থাকত না। কিন্তু একেবারে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ঢালাওভাবে বাংলায় শিক্ষা দেয়ার মতো অবস্থা তখন ছিল না। কোনো শিক্ষার মাধ্যমই রাতারাতি কার্যকর করা যায় না। ব্রিটিশ আমলেও সেটা হয়নি। এর কারণ যে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হবে তার জন্য একটা অপরিহার্য প্রয়োজন হল সেই ভাষায় বইপত্র লভ্য করা। কোনো শিক্ষার মাধ্যম সঠিকভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে শুধু সেই ভাষায় ক্লাস-বক্তৃতা দেয়াই যথেষ্ট নয়। বই যদি না থাকে তাহলে সেভাবে ক্লাস-বক্তৃতা দেয়া সম্ভব নয়, জোর করে আবোলতাবোল বক্তৃতা দিলে তার দ্বারা শিক্ষার কোনো উন্নতি হয় না। বাংলাদেশে সেটা হয়ওনি। বাংলাকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম করে দেয়া হল অথচ বাংলায় তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে বইপত্র ছিল না বললেই চলে। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বইও বাংলায় ছিল না। পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি জাতীয় অনুবাদ সংস্থা গঠন করে দেশ-বিদেশে শিক্ষিত এবং বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান লোকদের সহযোগিতায় নানা ভাষা থেকে বই অনুবাদ করে ছাত্রদের জন্য লভ্য করা। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। কাজেই একদিকে বাংলায় বক্তৃতা এবং অন্যদিকে বক্তৃতার বিষয়বস্তুর ওপর কোনো বই না থাকার পরিণাম যে কী হতে পারে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কাজেই যা হওয়ার তা-ই হল। বইয়ের অভাবে এসব বিষয়ে অতি নিম্নমান নোটবই বাজারে ছেয়ে গেল এবং ছাত্ররা তা-ই পড়ে 'উচ্চশিক্ষা' লাভ করতে থাকল। শিক্ষার মান রাতারাতি নিচে নেমে গেল। এ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী পাওয়া ছাত্রদের মানও ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেল। কিন্তু তারাই আবার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। কাজেই তাদের ক্লাস-বক্তৃতা বাংলায় হলেও স্বাভাবিকভাবেই তার মান খুব নিম্ন হল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত নামমাত্র শিক্ষায় পরিণত হল। এর থেকে বড় বিপর্যয় শিক্ষা ও জাতির জীবনে আর কী হতে পারে? সেই পরিস্থিতিতে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার অবনতি শিক্ষার্থীদের নতুন করে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার দিকে ঠেলে দিল। এই চাহিদা মেটাতে দেশে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকল। অভিভাবকেরা বাধ্য হয়ে নিজেদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে দিতে থাকলেন। এ প্রক্রিয়া বিস্তার লাভ করে বর্তমানে কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যাতে টাকা-পয়সাওয়ালা অনেক পরিবারের সন্তানরা এখন বাংলা জানে না বা ভালো জানে না বলে গর্ব অনুভব করে এবং ইংরেজিতে কথা বেশি বলে। এদিক দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা এত শোচনীয় দাঁড়িয়েছে যে, শুধু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ছাত্ররা দলে দলে ভর্তি হচ্ছে। কারণ সেখানে ইংরেজির চর্চা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। এদিক দিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যা পাকিস্তানি আমলে ভাষা আন্দোলন ও তার পরবর্তী পর্যায়ে কল্পনা করাও যেত না। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালিদের শাসনে কোনো সুষ্ঠু ও প্রকৃত শিক্ষানীতি ১৯৭২ সাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত না থাকাই যে এ পরিণতির কারণ, এতে সন্দেহ নেই।

শুধু শিক্ষার মাধ্যমের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য ক্ষেত্রেও বিপর্যয়ের সূচনা ১৯৭২-৭৩ সালেই হয়েছে। ধর্মীয় মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে না এনে সরকারিভাবে তাকে উৎসাহিত করাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাসাগুলোতে সরকারি অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হল এবং তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। এরপর জিয়াউর রহমানের সময়

যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তখন তারা নিজেদের গৌরব-কীর্তনের ব্যবস্থা তাতে যেভাবে করে এটা শিক্ষা ব্যবস্থার এক বিপজ্জনক দিক। এর ফলে শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। শুধু এটাই নয়, ইতিহাসকে পাঠ্য বিষয় থেকে এভাবে বাদ দেয়ার কারণে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রী, সাধারণভাবে বিদ্যার্থী এবং জনগণকে নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির ব্যাপারে প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই রাখা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার কদর আরও বাড়ল। তিনি মাদ্রাসার পাঠ্য হিসেবে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তার আধুনিকীকরণ ঘটানোর চেষ্টা করলেন। মাদ্রাসার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার চরিত্রের কারণে এর দ্বারা তার আধুনিকীকরণ ঘটল না। মাদ্রাসা ছাত্রদের চিন্তার পশ্চাৎপদতা দূর হল না। কিন্তু তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হল। আগে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাদ্রাসা ছাত্রদের কোনো সংগঠন না থাকলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে মাদ্রাসার ছাত্ররা গঠন করল ইসলামী ছাত্রশিবির। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এরপর শুরু হল ছাত্র সন্ত্রাস। শুধু তাই নয়, এরপর কওমি মাদ্রাসা নামে প্রাইভেট মাদ্রাসার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও কোনো সরকারের পক্ষেই তার নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তার বন্ধ করা হল না। এ ধরনের পাঠ্যক্রম সাধারণ মাদ্রাসার পূর্ব পাঠ্যক্রমের থেকে অনেক বেশি পশ্চাৎপদ হওয়ায় এর বিষময় ফল শুধু শিক্ষাব্যবস্থাতেই নয়, সমাজেও ব্যাপকভাবে দেখা গেল। এর ফলে ধর্মীয় সন্ত্রাস আরও বৃদ্ধি পেল। এগুলোকে অবলম্বন করে জামায়াতে ইসলামী তার রাজনৈতিক প্রভাব এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হল।

বাংলাদেশের 'প্রগতিশীল' শিক্ষানীতি অনুযায়ী স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যক্রম থেকে ইতিহাসকে নির্বাসিত করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের মধ্যে সামান্য কিছু পৃষ্ঠাজুড়ে ইতিহাসের নামে যা পড়ানো হয় তা ইতিহাস পদবাচ্য নয়। তাছাড়া যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তখন তারা নিজেদের গৌরব কীর্তনের ব্যবস্থা তাতে যেভাবে করে এটা শিক্ষা ব্যবস্থার এক বিপজ্জনক দিক। এর ফলে শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। শুধু এটাই নয়, ইতিহাসকে পাঠ্য বিষয় থেকে এভাবে বাদ দেয়ার কারণে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রী, সাধারণভাবে বিদ্যার্থী এবং জনগণকে নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির ব্যাপারে প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই রাখা হয়েছে। যে জাতি নিজের ইতিহাস জানে না, সে জাতির থেকে হতভাগ্য আর কে আছে? যে জাতি নিজের ইতিহাসকে এভাবে অন্ধকারে রাখে সে তার বর্তমানকে সুষ্ঠু ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে— এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে ঠিক এটাই যে হয়েছে, এ বিষয়ে মূঢ় বা মতলববাজ ছাড়া অন্য কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সরকারই এর জন্য দায়ী। তারা কেউ কেউ এক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেও তার মধ্যে এই বিপদ দূরীকরণের ব্যবস্থা তো নেই-ই, এমনকি এই বিপদের সংকেত পর্যন্ত দেখা যায়নি।